উপসংহার

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটে যায় সমাজ। পালটে যায় ভৌগোলিক মানচিত্রও। একইসঙ্গে পালটায় আর্থ-সামাজিক কাঠামো সহ সমাজ মনন প্রক্রিয়া। শিক্ষা রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনগোষ্ঠীর লোকায়ত আচার পদ্ধতি পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়। নব নব রূপে ধারাবাহিক গতিপ্রবাহে ভিন্ন সংস্কৃতি ভিন্ন ভাবনা ও বিশ্বাস আশ্রয় পায়। অন্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি ঘটে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলার জলপাইগুড়ি প্রান্তীয় অংশের উপর দিয়ে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সংস্কৃতির আগমন ঘটেছে। অনন্তকাল ধরে নতুন নতুন জাতি-জনজাতি গোষ্ঠীর ঢেউ আছড়ে পড়েছে। তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে, লৌকিক ও অলৌকিক বিশ্বাসে ধর্মীয় ভাবধারাও পুষ্ট হয়েছে। এই ধর্মীয় সম্প্রীতি বিস্তৃত অঞ্চলকে প্লাবিত করেছে। বঙ্গদেশে আর্যীকরণের সূত্র ধরে রাজবংশী সমাজের হিন্দুত্বগ্রহণ, ভাষা-সংস্কৃতির আত্তীকরণ ঘটেছে। সামগ্রিক হিন্দু শাস্ত্রীয় ধর্মকর্মাদি গৃহীত হলেও আঞ্চলিকতা ভেদে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী, বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহারে একটা স্বতন্ত্র ধারা আজও লক্ষণীয়। তথ্য প্রযুক্তির বিস্তার, নাগরিক স্পর্শের বিশ্বায়নে গ্রামীণ জীবনের মূলধারাও একটা ব্যাপক পরিবর্তন কিন্তু স্পষ্ট। এ শুধু রাজবংশী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বলতে গেলে প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই প্রায় সমানভাবে প্রযোজ্য।

রাজবংশী সমাজের প্রার্থনীয় কামনা-বাসনা একান্তভাবে পার্থিব এবং নিতান্ত দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়তা কেন্দ্রিক। কৃষিনির্ভর সমাজ জীবনেও বেশিরভাগ দেব-দেবী, পূজা-পার্বণ উপলক্ষাদি এবং তৎসম্পর্কীয় সংগীত, এমনকী মন্ত্রাদিও ক্রিয়াকর্মভিত্তিক। স্থান পেয়েছে নদী, বৃক্ষ, সময়, কখনও অলৌকিক ঘটনা কিংবা ভাবনা। আবার একই দেব-দেবী অঞ্চল ভেদে ভিন্ন নামে, ভিন্ন আচারে পূজিত হয়ে আসছে। লৌকিক বিশ্বাসের শিকড় বহুধা বিস্তৃত। আবার এই পূজা আচারকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে অজস্র লোকগান, লোককথা, লোকসাহিত্য সর্বোপরি লোকবিশ্বাস। আবার আঞ্চলিক সহাবস্থানে একাধিক জনজাতির দেব-দেবী বিশ্বাসের মধ্যেও

সমান্তরাল মেলবন্ধন ঘটেছে। আবার আচার-বিচারেও যথেষ্ট একাত্মতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

রাজবংশী সমাজ সহজ-সরল নিরুপদ্রব জীবনে অভ্যস্ত ছিল। ছিল মূলত কৃষিজীবী। হাতে বোনা কাপড়-চোপড়। বাহুল্যবর্জিত খাবার-দাবার। বিনোদনপ্রিয়। ভাবনাচিন্তায় উদারতা, গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং স্বাধীন খেয়ালের প্রকৃতি প্রেমিক। প্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত শক্তির পূজারি। সহজ, সরল এবং অকপট। মাতৃতান্ত্রিক। এই ছিল এক সময়ের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ঘরানা-পরিবার-সমাজ। অধিকাংশ লোকদেবতাই বিমূর্ত। পূজাস্থলে লাল-সাদা নিশান, প্রস্তরখণ্ড, মাটির ঢিবিই দেব দেবীজ্ঞানে পূজিত হত। হাল আমলে বিশ্বাস আচারে বহু পরিবর্তন হলেও মূল বিশ্বাসের নিদর্শন এখনও গ্রামেগঞ্জে গেলে দেখা যায়। তুলসীমঞ্চ সব বাড়িতেই অধিষ্ঠিত, ব্রাহ্মণ্যধারায় পরবর্তীকালে একাধিক লৌকিক দেবতা শাস্ত্রীয় স্বীকৃতিও লাভ করে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে শঙ্করীয় বৈষ্ণব ভাবধারায় এতদঞ্চলের প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ই প্রভাবিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারারও সম্প্রসারণ ঘটে। সেই বিশ্বাসের জায়গাটা এখনও অবিকল একই রকম রয়েছে, তবে পরিবর্তনের ছোঁয়া একটু-আধটু লেগেছে বইকি।

চাঁদোয়া টাঙিয়ে পূজা পদ্ধতি আজও প্রচলিত। বাড়ির যে কোনও কাজকর্মে সে মঙ্গল কিংবা অমঙ্গলই হোক, তুসলীতলায় অধিকারী পুরোহিত বোষ্টম দিয়ে সেবা (পূজা) দেওয়ার রীতি এখনও প্রচলিত। তবে তা গ্রামাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। আবার মৃতদেহ সৎকারের পর দাহস্থানেও চাঁদোয়া টাঙিয়ে দেওয়া রাজবংশী সমাজের রীতি। নবজাতক শিশু কিংবা মৃত ব্যক্তির শান্তি স্বস্ত্যয়ন বা অশৌচ কাটানোর জন্যও তুলসীতলায় সেবা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। আবার তুলসী মঞ্চের পাশে দণ্ডে লাল নিশানের অবস্থান প্রাচীন ভারতীয় কপিধ্বজের ক্ষীণ স্মৃতি বলে ধরে নেওয়া যায়। অন্যদিকে রাজবংশী সম্প্রদায়ের এক বিরাট বিশেষত্ব শুধু হিন্দু সংস্কৃতি নয়, বৌদ্ধ থেকে ভুটানি এমনকী মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় লোকাচারকে মান্যতা দিয়ে আপন ধর্মাচারের অঙ্গীভূত করেছে। এক অসম্ভব ধর্ম সহিষ্ণুতা, উদারতার প্রতিভূ এই সমাজ অনেক কিছুকে আত্মস্থ করে আজকের বাঙালি তথা হিন্দু-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হয়েছে। শাস্ত্রীয় অথবা তথাকথিত উচ্চবর্গীয় বর্ণহিন্দুদের কাছে তাদের ব্রাত্যতা ঘুচুক বা না ঘুচুক রাজবংশী সমাজ আধুনিক বাঙালি ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক-বাহক, এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

অন্তরে ও বহিরঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিয়েছে। এমনকী বিয়েতে গ্রহণ বর্জনের কোনও বিধিনিষেধ কিংবা সংরক্ষণ গোঁড়ামির মানসিকতা আর নেই। এই ব্যাপারে সমগ্র বাঙালি সমাজও বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। মিলিবে আর মিলাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি মিলেমিশে একাকার।

সময়ের স্রোতে শিক্ষা-সভ্যতা তথা আধুনিকতার বিস্তার ঘটেছে। নগরায়ণ প্রসারিত হয়েছে। সংঘবদ্ধ সমাজ জীবনের আদি ছবি উধাও। বিশ্বায়িত বিজ্ঞাপিত আহ্লাদ আহ্বানে নতুনের হাতছানি। চিরায়ত সংস্কৃতির ধারা, আচার ব্যবহারের পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে বিকৃতি হচ্ছে। তবে সময়ের দাবি মেনে পরিবর্তনকে স্বীকার করলেও ঐতিহ্য পরম্পরাগত ধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা যেমন জরুরি, তেমনই প্রয়োজন ঐতিহ্যের বিস্তার ও সঞ্চরণ। শুধু রাজবংশী সমাজ নয়, ভারতবর্ষের অসংখ্য জনজাতি সমৃদ্ধ কৃষ্টি-সংস্কৃতির সম্ভারে ভারতাত্মার যথার্থ বার্তা ঘোষিত এবং বিবিধের মাঝে মহামিলনের সুর উচ্চারিত হয়। আমাদের মতো দেশে শত শত জাতির নিজস্ব সত্তা বিকাশের মধ্যে দিয়েই দেশ মাতৃকার আসল সত্তার বিকাশ নিহিত আছে। পরিবর্তনকে অস্বীকার করে নয়, সামগ্রিক গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে আত্মস্থ করতে হবে।

খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি, ক্রিয়াকর্ম, বিনোদন থেকে পূজা-অর্চনা, আচার-ব্যবহার — সর্বত্রই রাজবংশী সংস্কৃতিতে পরিবর্তন এসেছে। রাজবংশী সমাজে লক্ষ্মীপূজার রীতি সাধারণ বাঙালি সমাজের রেওয়াজ, ক্ষত্রিয়-রাজবংশী সমাজে সংযোজিত হয়েছে। ক্ষেতি বা ডাকলক্ষ্মী পূজাই রাজবংশী সমাজের আদি ও অকৃত্রিম লক্ষ্মীপূজা। সরস্বতী পূজাও আসলে নব সংযোজন। সরস্বতী পূজা আসলে শারদীয়া দুর্গোৎসবে দশমীর দিন যাত্রা পূজার নামান্তর। যাত্রা পূজাই রাজবংশী সমাজের প্রকৃত বাণীবন্দনা। জামাই ষষ্ঠীও রাজবংশী সমাজের নিজস্ব আচার পর্ব নয়। পরে সংযোজিত হয়েছে। বরং এখন বিয়ে বা অষ্টমঙ্গলার আনুষ্ঠানিক পর্ব হারিয়ে গেছে। হারিয়ে যাচ্ছে বিষহরা পালাগান। বিয়ের শুরুতে বিষহরা মাড়েয়া গান শুরু হয়ে অষ্টমঙ্গলায় শেষ হত। সে-পর্ব সংক্ষিপ্ত হতে হতে প্রায় উঠে যাবার উপক্রম হয়েছে। বর্তমানে শোলার চুঙি বানিয়ে সাধারণ ভাবে বা স্বহস্তেই পূজা সারা হয়। অন্যান্য গানের পর্ব একেবারেই অন্তর্হিত। কলাপাতা কিংবা কলাগাছের খোলে সারি সারি বসে খাওয়ার রেওয়াজও ক্যাটারার কেড়ে নিয়েছে। দই-চুড়ার (চিড়া) পর্বও অতি সংক্ষিপ্ত। অনেক ক্ষেত্রে পানিছিটা বাবা, মিস্তর ধরার

পর্বও বাদ। বউভাতের দিন গ্রামের পাঁচ দেওয়ানির বধূর মান্যতা প্রদান এখন আর ততটা জরুরি নয়।

বিয়েতে গোত্রবিচার আজকাল আর বিশেষ দেখা হয় না। ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিয়ে প্রায়ই ঘটছে। বিয়ে বিভিন্ন প্রকার — ফুল বিয়ে, ঘরজিয়া বিয়ে, ছত্রদানি বিয়ে, ভাউজ বিয়ে, ঘর সোন্দানি বিয়ে, গন্ধর্ব বিয়ে ইত্যাদি সব এখন কাগজের পাতায়। রীতিনীতিতে একদম বর্ণহিন্দুর প্রভাব। আগে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে পণ দিত। এখন বরপণ না দিলে বিয়ে হয় না। গরুর গাড়িতে কোনও বরযাত্রী যাওয়ার ছবি আর নেই। ডিজেল, পেট্রোল গাড়িতেই বরযাত্রীর প্রচলন ঘটেছে। কড়কা, সানাই-এর বাজনা পার্টিও উধাও।

একসময় কত রকমের দইয়ের ব্যবহার ছিল। গলেয়া দই, ট্যাঙা দই, ঝাল ট্যাঙা দই, নাথুয়া দই, গ্যারস্থ দই, ছাঁচি দই, কাঁচা দই, আম কাঁচা দই ইত্যাদি বিচিত্র নামের, বিচিত্র স্বাদের দই। তৈরিও হত বিচিত্র পদ্ধতিতে। সে সময় মানুষ খেতেও পারত। যে কোনও অনুষ্ঠানে দই-চিড়ে অবশ্যই থাকত। পূজা-পার্বণের প্রধান উপাচারও ছিল দই-চিড়ে। ধর্মীয় ব্যাপারেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষণীয়। লৌকিক দেবদেবীর প্রাধান্য গ্রামাঞ্চলে থাকলেও শহর, মফস্বল শহরে নেই বললেই চলে। বর্তমান প্রজন্ম এসব ঠাকুর-দেবতার নামই জানে না। যখা ঠাকুর, বিষ্টু ঠাকুর, জাখালা ঠাকুর, বুড়াঠাকুর, ধরমঠাকুর, গাবুরঠাকুর, ঠাকুরানী ইত্যাদি অসংখ্য ঠাকুরের থান অবশ্য গ্রামগঞ্জের কোথাও কোথাও চোখে পড়ে। বাড়ির পাশে সারি সারি মাটির ঢিপি অথবা পাথরে অধিষ্ঠিত দেব-দেবীর ছোট ছোট ঘর আর পাশে পাশে নিশান এখন কমই দেখা যায়। বছরে এক-আধবার পূজাও দেওয়া হয়, তবে আগের সেই উৎসবের মেজাজ নেই। সামর্থ্যেও টান পড়েছে। ধর্মভয়ও আগে যেমন ছিল, তা আর এখন নেই। ঠাকুর ধরেছে, ভূতে পেয়েছে বলে আগের মতো ওঝা, গুণীন, গোঁসাই-এর কাছে মানুষ ছুটে যায় না। ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্রেও সে আস্থা নেই। জলকষা আর শান্তির জলে এখন শান্তি পায় না। বরং অ্যালোপ্যাথি নির্ভরতা ষোলো আনা। তবে কবিরাজি, আয়ুর্বেদিকে এখনও বেশ আস্থা আছে। মহিলাদের মধ্যে এখনও তুকতাকে একটু-আধটু ভীতি আছে। গৃহনির্মাণেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। উত্তরমুখো-পশ্চিমমুখো শোবার ঘরে আপত্তি নেই। ‘পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ। উত্তরে গুয়া, দক্ষিণে ধুয়া’ সে রীতি মানার বিশেষ সুযোগ নেই। ডারিঘর (অতীতের বৈঠকখানা) উধাও। বাঁশ, কাঠের বদলে পাকা বাড়ির ঝোঁক।

পান সুপারির চাষ শুধু খাওয়ার জন্য নয়, রীতিমতো বাণিজ্যিক-অর্থনৈতিক ফসল। রাজবংশী সমাজ বাড়িভাড়া দেওয়ার কথা ভাবতেই পারত না, এখন বাড়ি ভাড়া দিতে যেমন আপত্তি নেই, তেমনই ভাড়া বাড়িতে থাকতেও কুণ্ঠা নেই।

খাদ্যাভাসের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। সকালের খাবার এখন আর চিড়ে-মুড়িতে সীমাবদ্ধ নয়। লুচি পরোটাও চলে। তবে গ্রামাঞ্চলে পান্তাভাত এখনও জনপ্রিয়। ছ্যাঁকা, প্যালকা, শুটকা, সিদোলের ব্যবহার প্রায় উঠে যাওয়ার মতই। তবে এসব খাবারের জিনিসপত্র জোগাড় করাও বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। থালাবাটি কাঁসা-পিতলের বদলে স্টিলে গিয়ে ঠেকেছে। আচার-অনুষ্ঠানে কলাপাতার কিংবা খোলের ব্যবহারও উঠে যাওয়ার মতই। শালপাতার ব্যবহার সমানভাবে প্রচলিত হয়েছে। পিঁড়ি পেতে খাওয়ার চল গ্রামাঞ্চলে থাকলেও শহরে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চিতে বর্তমান প্রজন্ম অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাড়িতে কেউ এলে এখন আর পিঁড়ি পেতে দেওয়া হয় না। চেয়ার, টুল, বেঞ্চিই দেওয়া হয়। ফাস্ট লাইফে ফাস্ট ফুডও বেশ জায়গা করে নিয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে।

চাষবাসের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এক ফসলে আর কেউ চুপচাপ বসে থাকে না। আধুনিক পদ্ধতিতে রাসায়নিক সারে একাধিক ফসল। দেওয়া নেওয়ার পর্বও উঠে গেছে। গরু-মোষের বদলে ট্রাক্টর দিয়েও চাষবাস হচ্ছে। উন্নতমানের বীজ, বেশি ফলনের জন্য সেচ, সার, কীটনাশক প্রয়োগে দ্বিধা নেই। একসময় এসব এলাকায় একশোর বেশি প্রজাতির ধান চাষ হত। মহারাজা, ভুসরা, পাখরি, লোহাজং, বোচি, হুজুরি, ধাউলি, যশোয়া, বামনভোগ, নুনিয়া, কালোজিরা ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের ধান। এসব ধান কোথাও কোথাও দেখা গেলেও অধিকাংশই হারিয়ে যাচ্ছে। চাষের কাজে 'হাওয়ালি' পদ্ধতি (পাড়া প্রতিবেশী মিলে কারও কাজ করে দেওয়া। শুধু হাঁস, মুরগি, পায়রার মাংস দিয়ে একবেলা খাওয়া দিলেই হত) 'গাঁতা' নেওয়া (পালা করে সবাই মিলে এক এক করে সবার কাজ করা) একদম উঠে যাওয়ার মতো। আগে এই পদ্ধতিতে চাষের কাজও করে নেওয়া হত। এভাবে পাড়া প্রতিবেশীর মহিলারা চিড়ে, চাল কুটে নিত। গম, ভুট্টা, যবের গুঁড়োও করে নেওয়া হত এই ছামগাইনে। ছাতুর মতো খাওয়া হত। এখন আর হয় না। বাচ্চারাও বিস্কুটে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ডাল ভাঙার চাকতি এখন তো গ্রামের বাড়িতেও দেখা যায় না। জিনিসপত্র গরু-মোষের গাড়ি কিংবা ঘাড়ে করেই

আনা-নেওয়া করত। এখন সে জায়গায় এসেছে ঠেলা, রিক্সা, ভ্যান। মাথায় করে জিনিসপত্তর নিয়ে যাওয়ার ছবি বিশেষ দেখা যায় না। আগে রাজবংশী সমাজের মানুষ হেঁটে হেঁটেই বহুদূর যেত। তখন অবশ্য যানবাহন বিশেষ ছিল না। যান বলতে ছিল গরুর গাড়ি। এখন কিন্তু হাঁটার অভ্যাসটাও কমে গেছে। বদলে সাইকেল, ভ্যান, রিক্সা, অটো, বাস। জিনিসপত্র থাকলে তো কথাই নেই।

পোশাক-পরিচ্ছদে আলাদা পার্থক্য নেই। কী ছেলে, কী মেয়ে। পুরো আধুনিক। মধ্য বয়স্করাও প্যান্ট, শার্ট, পায়জামায় অভ্যস্ত। ধুতি পাঞ্জাবিও ধোপদুরস্ত। 'ফোতা', 'পাটানী', 'বুকুনি' প্রবীণারা ছাড়া কেউ পরে না। লুঙ্গির বহুল চল হয়েছে। মহিলারা শাড়িই পরেন। তবে গ্রামাঞ্চলে মহিলারা কাজকর্মে ও বাড়িতে থাকাকালীন ব্লাউজ সবসময় ব্যবহার করেন না। মেয়েরা চুড়িদার এমনকী প্যান্ট-শার্টও পরে। আর শহরাঞ্চলে তো পোশাকের আলাদা কোনও পার্থক্যই নেই। আধুনিক প্রজন্মের সন্তানদের কাছে টিভি, সিনেমার বিজ্ঞাপনের পোশাকই বেশি গ্রহণযোগ্য। তবে বাড়িতে গামছা পড়ে থাকার অভ্যাস এখনও রাজবংশীদের মধ্যে দেখা যায়।

নামকরণের ক্ষেত্রে আধুনিকতার ছাপ। সোমবার জন্ম হয়েছে বলে সোম্বারু, বিষুদবারে হলে বিষাদু এখন আর রাখা হয় না। নামকরণের ক্ষেত্রে বাঙালি সমাজের ক্ষেত্রে যে প্রবণতা রাজবংশী সমাজের বেলাতেও তাই। অতি আধুনিক নাম। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়ার সংখ্যা বেড়েছে। গানবাজনা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও রাজবংশী সমাজের মেয়ে মহিলারাও অকপটে অংশ নিতে পারে। কোনও বিধিনিষেধ আরোপিত নেই। বিভিন্ন কাজকর্মেও মহিলা, মেয়েরা সমান এগিয়ে। তবে লক্ষণীয় যে পুরানো ধ্যানধারণা ঐতিহ্য অপেক্ষা আধুনিক নাগরিক ধ্যান-ধারণায় বর্তমান প্রজন্ম বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে।

বিনোদন মানসিকতাও ব্যাপক বদলে গেছে। টিভি, ভিডিও, সিনেমামুখর বিনোদন এখন রাজবংশী সমাজেও। ভাষাভঙ্গী বদলে যাচ্ছে। দোতরাডাঙ্গা, কুশানগান কিংবা পদ্মপুরাণের গানের আসর বাড়িতে বা মহল্লায় সে ভাবে আর বসে না। তবে ভাওয়াইয়া সংগীতের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। শুধু রাজবংশী সমাজ নয়, অন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষও ভাওয়াইয়ার সুর মাধুর্য উপভোগ করেন। তবে পালাগান-লোকনাটকের ধারা গতিরুদ্ধ হওয়ায় পুরানো বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্র হারিয়ে যাবার পথে। বেনা, সারিন্দা, খমক ইত্যাদি। তথ্যপ্রযুক্তির দৌলতে ইদানীং

অবশ্য পালাগানগুলি সিডি, ফিল্মবন্দি হচ্ছে। সেটাও ভাল দিক। তবে মেঠো স্বরলিপি মাটিধুলোতেই যে ভাল শোনায় সে পরিসর আর ভাওয়াইয়ার ক্ষেত্রেও নেই।

বিনোদনের আরেকটি অনুষঙ্গ লোককথা, কিচ্চা, লোকগল্পের পরিবেশ উধাও। আগে দাদু-দিদিমা-ঠাকুমাদের গল্পগুজবদের মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হত। সেটা এখন হয় না। বর্তমান প্রজন্ম পড়াশোনা আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে বড় ব্যস্ত। শীতের সন্ধ্যায় আগুনের পাশে গোল করে বসে ইতিহাস, ভূগোল, শৌর্যবীর্যের সে-গল্পগাছা আর নেই। টিভি, ক্যাবল, ডিশ অ্যান্টেনা এখন গ্রামগঞ্জেও। শৈশব-কৈশোরের লোকক্রীড়া উধাও। গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা, হাডুডু, ডাংগুলি, চোরপুলিশের খেলার উদ্দাম বিনোদন আর নেই। টিভির ফুটবল আর ক্রিকেট সময় কেড়ে নিয়েছে। মাঠে অবশ্য ছেলেরা ক্রিকেট চর্চাই করে। একসময় মাছ মারাও ছিল বিনোদন। বিশেষ করে মহিলারা দল বেঁধে হৈ হৈ করে মাছ ধরতে নামত। 'বাহো'-তে পাড়ার সবাই একযোগে মেতে উঠত। এখন সে রকম জলাশয়ও নেই, মাছ মারাও উঠে যাচ্ছে। ঝাঁখে, ঢোসকা, ট্যামাই, বুরুং নয়, এখন জাল দিয়েই মাছ ধরার মধ্যেও এসেছে আধুনিকতা। বিনোদন নয় নিতান্ত ইচ্ছের ব্যাপার। বিনোদনে একাধিক আধুনিক বিষয় সংযুক্ত হওয়ায় স্বাভাবিক লোকক্রীড়াগুলি পরিসর হারিয়েছে। হারিয়ে গেছে গ্রামীণ মেলা পরবগুলির নিজস্বতাও।

খেলাধূলা	বিলুপ্ত / প্রস্থান
১। বুড়ি ভাষা খেলা।	১। বিলুপ্ত।
২। কাঁদো খেলা বা নারিকেল খেলা।	২। বিলুপ্ত প্রায়।
৩। ধূলিয়া খেলা (part of holly, mud) plastering each other an intimacy with).	৩। বিলুপ্ত প্রায়।
৪। চোকোর চাল খেলা (a game of skill)	৪। বিলুপ্ত প্রায়।
৫। ষোলো পাইটের খেলা।	৫। বিলুপ্ত প্রায়।
৬। ডোর খেলা বা ধাই খেলা (like ha-du-du)	৬। বিলুপ্ত প্রায়।
৭। পাখি খেলা।	৭। বিলুপ্ত প্রায়।
৮। ধূপ খেলা (like cricket)	৮। ক্রিকেট খেলা এসেছে।

১

লৌকিক বিশ্বাসেও চিড় ধরেছে। বৃক্ষোপাসনা রাজবংশী সমাজের সুপ্রাচীনকালের ঐতিহ্য। শিশুর দীর্ঘজীবন কামনায় জিগা গাছের পূজা কিংবা তার সঙ্গে সখীপাতার রেওয়াজ উঠে

গেছে। বট-পাকুড়ের বিয়ে দেওয়ার রীতিও প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। উঠে যাচ্ছে সখাসখী, ভাদাভাদির মতো অনুষ্ঠানগুলি। আগে পূজা-পার্বণে বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানানোই হত না। অসমিয়া ব্রাহ্মণরাই অধিকারী ব্রাহ্মণদের সহযোগিতায় গৃহস্থবাড়ির পূজা-অর্চনার কাজকর্ম সম্পন্ন করতেন। এখন তথাকথিত ব্রাহ্মণদের দিয়েই পূজা-পার্বণ সম্পন্ন করা হয়। তারাও আসেন এবং রাজবংশী সমাজেরও কোনও সংরক্ষণ মানসিকতা নেই।

জীবন-জীবিকা ব্যাপ্ত হয়েছে। একসময় রাজবংশী পরিবার জমিতে কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকত। মোটা ভাত, মোটা কাপড়, মেঠো স্বরলিপি নিয়ে সহজ-সরল জীবনে অভ্যস্ত ছিল। একসময় চাকুরি বিমুখও ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সময়ের দাবি মেনে বিভিন্ন বৃত্তিতে অংশ নিচ্ছে। এখন ব্যবসা-বাণিজ্য থেকেও যাবতীয় কাজকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। এমনকী শ্রমসাধ্য কাজ ঠেলা, রিক্সা চালানো থেকে ট্রাক লরির লেবার, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক সবেতেই চোখে পড়ে। পুরুষ-মহিলার সংখ্যাও চোখে পড়ার মতো। বাড়ির মহিলারাও পরিবারের স্বার্থে মাঠে-ময়দানে শ্রমিকের কাজ থেকে ঝিয়ের কাজও করে সংসারের দায়িত্ব ভাগ করে নিচ্ছে। বর্তমানে কাজের পরিধি যেমন বেড়েছে, তেমনই রাজবংশী সমাজের অংশগ্রহণও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজবংশী সমাজের জীবন বৃত্তি, জীবন-জীবিকার হাত ধরেই শহর গ্রামের দূরত্ব কমে এসেছে। ভাষা, ব্যবহার, আচার-সংস্কৃতি, এমনকী মনন ক্রিয়াও পালটে যাচ্ছে। আর এভাবেই ঘটে চলেছে রাজবংশী সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির রূপান্তর।

রাজবংশী সমাজের এই বিবর্তন, পরিবর্তনের আলো-আঁধারি তার পেছনে বহু কারণ — সমাজসম্পর্ক, শিক্ষাসংস্কৃতি, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক কাঠামো, সময় প্রক্ষীপ্ত বহু বিষয় ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এমনকী রাজনৈতিক কারণও অনেকাংশে যুক্ত। সমাজ সময় প্রেক্ষিতে এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। প্রগতির সূচকও বটে। এক সময়ের গোষ্ঠীবদ্ধ ও সংরক্ষণশীল রাজবংশী সমাজ বৃহত্তর বর্ণহিন্দু সংস্কৃতির সুদীর্ঘ সহাবস্থানে ভাব, শিল্প, সংস্কৃতির আদানপ্রদান হয়। ঘরে বাইরে এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। শিক্ষার প্রসার, গ্রামীণ পরিবারতন্ত্রে ভাঙন, যোগাযোগ ব্যবস্থার বৃদ্ধি, রেডিও, টিভি, সিনেমার প্রভাব ইত্যাদির জন্য প্রাচীন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি, সামাজিক নৈকট্য, প্রতিযোগিতা ইত্যাদির জন্য সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আবার কিছু

রাজবংশী মানুষ শিক্ষার প্রসার, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা তারই সঙ্গে শহরমুখী মানসিকতার জন্য রাজবংশী সমাজের চিরায়ত সংস্কার, কৃষ্টির কাঠামো থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অন্যদিকে বিশাল জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ অর্থনৈতিক দূরবস্থার কারণে প্রাচীন ধর্মকর্মানুষ্ঠানগুলি পালনে অক্ষম হয়ে পড়েন। জীবন-জীবিকার স্বার্থে তারাও নিজস্ব সংস্কৃতি আচারে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। আবার ধর্মীয় উদারতা, আদর্শায়িত সাংস্কৃতিক প্রভাব, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব সহ জাতীয়তাবাদী মানসিকতায় প্রাচীন সাংস্কৃতিক ধারার প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সামাজিক অবস্থান, বিভিন্ন ভাষা, ধর্মসম্প্রদায়গত পারস্পরিক বোঝাপড়া, লেনদেন, ভাববিনিময়ের মধ্য দিয়েও নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতির ঘেরাটোপ খানিকটা ছিন্ন হয়। রাজবংশী সমাজও দ্রুত বিভিন্ন মিশ্র সংস্কৃতি, মনন মানসিকতার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে আজকের রাজবংশী সমাজে উন্নীত হয়েছে। এই মহামিলনে বর্ণহিন্দু বাঙালি সংস্কৃতির যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তেমনই রাজবংশী সমাজের উদার মননে তা আত্মস্থ করার ক্ষমতাও সমান উল্লেখ্য। আবার পরম্পরায় নিজস্ব ঐতিহ্য, চেতনায় নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতিও শত অসুবিধা অভাব-অনটন সত্ত্বেও যথাসাধ্য ধরে রেখেছে। এটাই এই জনগোষ্ঠীর বিশেষত্ব, নিজস্বতা। এখনও বিবিধ পরিবর্তনকে আত্মস্থ করেও কৌম সমাজের অনেক কিছুই বহন করে এই রাজবংশী জনগোষ্ঠী।

গ্রাম আর গ্রামেতে নেই। সমাজের আনাচেকানাচে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব। সামগ্রিক উন্নয়ন, প্রতিযোগিতা, আধুনিক বিশ্বের বাজারমুখী মনন ক্রিয়া, উন্নত পৃথিবীর সমন্বিত নৈকট্য, সবকিছুই সব জনগোষ্ঠীকে এক বৃহত্তর সামাজিক অঙ্গনে একত্রিত করেছে, ধর্মকর্মে ভাবনায় আর নিজস্ব ছোট গণ্ডি নেই। এক সার্বিক মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। রাজবংশী সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। আর্যায়নের সুদূরপ্রসারী আত্মিক ও ধর্মীয় প্রভাব তো ছিলই, বর্ণহিন্দুত্ব, ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি, পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মিশ্র আচার-বিহারের প্রভাবে রাজবংশী সমাজের ধর্মসংস্কৃতির কাঠামোয় প্রভাব ফেলে। ধীরে হলেও এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া আজও চলছে। তবে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে ধর্মকর্ম, মন্ত্রশক্তি, আচার-বিচারে। এর জন্য তথাকথিত পুরোহিত সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল মানসিকতা যেমন দায়ী তেমনই দায়ী পরবর্তী উত্তরসূরী অভাব কিংবা বিশ্বাসে ফাটল।

আজকের বিশ্বায়নের প্রগতির যুগে পৃথিবীর কোন জনগোষ্ঠী তার নিজস্ব বৃত্তে আবদ্ধ থাকতে পারে না। গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর প্রতিটি জনগোষ্ঠী আধুনিক হয়ে উঠেছে।

রাজবংশী সমাজও এর বাইরে নয়। একটা নিরন্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলেই একান্ত চেনা লোকসমাজ মাঝে মাঝে অচেনা ঠেকছে। তবে এই সমাজ বিবর্তনের ছবি নমুনার ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ যেমন দরকার তেমনই সংরক্ষণ, বিশ্লেষণও দরকার। কারণ সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বর্তমানের উপাদান ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা জরুরি নতুবা সামাজিক ইতিহাস রচনাই দুঃসাধ্য এবং অসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।

অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে রাজবংশী সমাজজীবন থেকে। রাজবংশী সমাজের লোকায়ত ভুবন যেমন সংকুচিত হয়েছে তেমনি জীবনচর্যার প্রতিটি ধাপে বিভিন্ন পরিবর্তনের স্রোত লেগেছে। সেখানে নানাবিধ কারণ — সময়, পরিবেশ, আর্থ সামাজিক কাঠামো, পারিপার্শ্বিক চাপ সহ মনন চেতনার ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। কর্ম পরিসরের ব্যাপ্তি ঘটেছে, অবসর যাপন কমেছে। বিনোদনের পরিসর ও উপাদানেরও সংকোচন ঘটেছে। বিবর্তমান রাজবংশী সমাজের এই পরিবর্তন স্বাধীনোত্তর সময়ে শ্লথগতির হলেও বিশ শতকের শেষ কয়েক দশকে অত্যন্ত কঠিনভাবে আঘাত করেছে। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজ এক নতুন সংকটে আবর্তিত। কিছু সংগঠন, কিছু আন্দোলনও রাজবংশী সমাজ জীবনকে নতুনভাবে আলোড়িত করে। পাশাপাশি রাজবংশী সমাজের একটা শ্রেণি অপেক্ষাকৃত উন্নতি করে ব্যবসা কিংবা চাকুরিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শহরমুখী হয়। নিজস্ব ভাবনায় তৈরি করে নেয় মধ্যবিত্ত সমাজ। যাদের ভাবনায় সমাজজীবন শুধু নয় সংস্কৃতির অঙ্গন থেকেও তারা সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে। অতীতে রাজবংশী সমাজ জীবনে গ্রাম ও শহরের যে নিবিড় বন্ধন ছিল তাও ছিন্ন হয়। গ্রামীণ জীবনে অভাব, অনটন, পিছিয়ে পড়ার গ্লানি, সর্বস্ব হারানোর কষ্ট, আধিপত্যহীনতার বেদনা সেইসঙ্গে গ্রামে গ্রামে নব্য অবস্থাপন্ন ও প্রভাবশালী একটা শ্রেণির উদ্ভব রাজবংশী সমাজ জীবনকে সাংঘাতিকভাবে আলোড়িত করে। রাজনৈতিক সংশ্রব ও ইন্ধনও একটা অদৃশ্য বিভেদরেখার জন্ম দেয়। সেখানে ক্ষমতায়ন গ্রাম সমাজের চিরায়ত ছবিটিকেও পাল্টে দেয়। আবার ভূমি নির্ভর রাজবংশী সমাজ জীবন জীবিকায় ব্যস্ত হয়ে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়ে পড়ে। একদা যে রাজবংশী সমাজ বাঁধ রাস্তা কিংবা রেল লাইনের মাটি কাটার কাজ করত না, চা বাগানের কাজে যারা যুক্ত হয়নি, শিক্ষার ব্যাপারে যারা অনাগ্রাহী ছিল, এক ফসলি হৈমন্তিক ধান চাষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল তাদের সামনে তখন ভয়ঙ্কর সমস্যা। একপ্রকার জীবন যুদ্ধের লড়াই শুরু হয়। সামগ্রিকভাবে রাজবংশী সমাজ

এলোমেলো হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে জোতদাররা জমি হারিয়েছেন, দেওয়ানী, গিরি, আধিয়ার প্রজার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে তাদের মধ্যেও এক ধরনের অবসাদ, বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়। অভিবাসী মানুষদের আগমন, জমি জায়গার মূল্যবৃদ্ধি, বাসস্থান, চাষাবাদ, কর্মসংস্থান ইত্যাদির মাঝে কৌম ভাবধারার রাজবংশী মানুষজন এক চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে। শান্ত রাজবংশী গ্রামীণ সমাজে একটা চোরাস্রোত বইতে শুরু করে। বলতে দ্বিধা নেই রাজবংশী মানুষজন ক্রমশ পিছু হটতে থাকে। অনেকে ক্ষমতা আধিপত্য হারিয়ে রাজনৈতিকভাবে যুক্ত হয়, অনেকে বিক্ষিপ্ত আন্দোলনে সামিল হয়, কিছু সংগঠনও তৈরি হয়। তবে সামগ্রিকভাবে বলা যায় এইসবের ফলে রাজবংশীদের আত্মসচেতনতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি একটা প্রচেষ্টাও শুরু হয় আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের। বিভিন্ন পেশায় ছড়িয়ে পড়ে, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ে এবং কাজকর্মের মধ্যেও বর্ণহিন্দুদের ভাবধারার প্রভাব পড়ে। এই প্রচেষ্টায় অনেকে শহরমুখী হয়, কাজের সন্ধানে বহু যুবক যুবতী ভিন রাজ্যেও পাড়ি দেয়, কিছু মানুষ শহরাঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম সেটা ঠেলা রিক্সা চালানো থেকে মুটে মজুর, অসংগঠিত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ির মহিলারাও বাদ যায় না, তারাও ঠিকে ঝি থেকে নির্মাণ শিল্পের যোগানদার শ্রমিক, আয়া বিভিন্ন কাজে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও মাতৃতান্ত্রিক রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীরা কৃষিকাজে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু বর্তমান এই অবস্থা পূর্বে ছিল না। ফলত: রাজবংশীদের সমাজজীবনে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয় বিশ শতকের শেষ কয়েক দশকে। রাজনৈতিক কারণেও গ্রামগুলি ভিন্ন এক সমাজজীবনের আধার বিন্দু হয়ে ওঠে। সম্প্রদায়গত মনোভাবের সূক্ষ্ম বিভেদরেখাও ভেতরে ভেতরে সক্রিয় হয়। এই সুযোগে রাজবংশী সমাজের অনেকের মধ্যে হীনমন্যতা থেকে জাত্যাভিমানের (Superior Complex) বিষয়টি জাগ্রত হয়। অন্যদিকে অভিবাসী উদ্বাস্তু মানুষ আর্থ সামাজিকভাবে থিতু হওয়ার পর একপ্রকার আগ্রাসী মনোভাব পোষণ করতে থাকে। গ্রামের সহজ সরল স্বাভাবিক বিন্যাস বিঘ্নিত হয় এর ফলে। আর এই ডামাডোলে রাজবংশী সমাজের লোকায়ত ভুবন, পূজা-পার্বণ, আচার-সংস্কার, বিনোদন, সংস্কৃতির পরিসর ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অনেক কিছুই হারিয়ে যায়। বিবর্তিত হতে থাকে আরো অনেক কিছু। তার মধ্যে অন্যতম সাংস্কৃতিক পরিসর। কেননা রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি অনেকটাই পূজা পার্বণভিত্তিক এবং লোকায়ত ধর্মাশ্রয়ী। কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আবার তথাকথিত জোতদাররা

পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তাদেরকে ঘিরেই পাড়া, টারি, গ্রাম, সমাজ, পাল-পরব, বিনোদন, ভালো-মন্দ ইত্যাদি ছিল। জমিদারি উচ্ছেদ আইনে তাদের অবলুপ্তি; বর্গাদার, তেভাগা আন্দোলনে আধিয়ার জোতদারের সম্পর্কের অবনতি চিরায়ত রাজবংশী সমাজজীবনের ছন্দকে বিনষ্ট করে। হারিয়ে যায় পালাগান, পাঁচালী, পালাটিয়া, দোতরা, কুশানের মত লোকশিক্ষার মাধ্যমগুলি। গীদাল, বৈরাগীরা নেমে পড়েন জীবন সংগ্রামে। পরবর্তী প্রজন্মও আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এইভাবে চোরচুন্নী, সত্যপীরের গান, খ্যাপার গান, যুগীর গান, চার যুগের গান ইত্যাদি শ্রুতির বাইরে চলে যায়। পৃষ্ঠপোষকতার লোকজনও সরে যায় নতুন সময়ের দাবি মেনে। ইতিমধ্যে যোগাযোগ, শিক্ষা, বিনোদনের টিভি, রেডিও, ভিডিও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের আগমন ঘটে। রাজবংশী লোকজীবনের অনুষঙ্গগুলি মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়। অপরদিকে বর্ণহিন্দুদের অবস্থান এবং তাদের উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে মিশ্র সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। নতুন প্রজন্ম আধুনিকতার বশবর্তী হয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে রাজবংশী সমাজজীবন, তাদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন দ্রুত ঘটতে থাকে। পালাগানের আসর বসে না, পূজা-পার্বণে সেই কলেবর থাকে না, জীবনচর্যায় বিভিন্ন আচার সংস্কারে শিথিলতা আসে। বিভিন্ন ভাবধারার অনুপ্রবেশ (বিভিন্ন ধর্মগুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ, বৈষ্ণব ভাবনা ইত্যাদি) ঘটে। লোকায়ত সংস্কৃতির বিষয়গুলি অন্তরালে যেতে থাকে। আমাতি, বৈশাখী, আষাঢ়ী, তেরেয়া, যাত্রা পূজার মত অনুষ্ঠানগুলির গুরুত্ব কমতে থাকে। বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর লোকান্তর ঘটে। গোরখনাথ, সোনা রায়, ডাংধরা, রাখাল ঠাকুর ইত্যাদি বহু দেবদেবীর প্রভাব কমতে থাকে। নতুন নতুন কিছু পূজা-পার্বণ সংযোজিত হয়। যেমন — লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা, জামাইষষ্ঠী। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের গান, পূজা-পার্বণের গান হারিয়ে যেতে থাকে। এদিকে অধিকারী ব্রাহ্মণের সংখ্যা কমতে থাকায়, নতুন প্রজন্ম এই পেশায় না আসায় পূজা-পরবের অনুষ্ঠানগুলি সংকুচিত হতে থাকে। সর্বোপরি রাজবংশী কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠানগুলি বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারণ জমি হারিয়ে গবাদি পশু অথবা কৃষিকৃত্যাদির অনেক অনুষ্ঠানই লোকান্তরিত হয়। যেমন — ভোগা দেওয়া, আশ্বিন মাসে ক্ষেতে প্রদীপ দান (পাঁচকোল বাতি) আগ নেওয়া, নয়াখাওয়া, বুড়াবুড়ি, হুদোম দ্যাও এরকম আরও বহু অনুষ্ঠানের প্রচলন কমে যায়। আগ্রহও হারিয়ে ফেলে। কারণ এই কৃষিকে ঘিরেই রাজবংশী সমাজ জীবন সামগ্রিকভাবে আবর্তিত হত। কৃষিকে ঘিরেই জীবনচর্যা, অনুষ্ঠানাদি, মননভাবনা সর্বোপরি বিনোদন। স্বাভাবিকভাবে ভূমি

বিচ্যুত হয়েই রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতি সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং এক বিবর্তনের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। যে ধারা আজও অব্যাহত এবং বলা যায় আরও বেগবান হয়েছে। আজকের সময়ে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক অঙ্গন বিবর্তমান এবং এটাই সংস্কৃতির ধর্ম, যুগে যুগে সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত হয়। সেখানে আক্ষেপের জায়গা থাকবে কিন্তু সাংস্কৃতিক বিবর্তন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, বিভিন্নভাবে তা সংগঠিত হয়। সেটা যদি বিকৃত কিংবা আগ্রাসনের শিকার অথবা অবদমিত হয় তাহলে সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তার। যেকোন জাতি বা গোষ্ঠীর পক্ষে তো বটেই সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিপজ্জনক এবং অশুভ।

রাজবংশী মানুষের যে স্বাভাবিক স্বভাব সহজ, সরল, উদারতা, অতিথিপরায়ণ সেটা আজকে আর নেই। ভেতরে ভেতরে প্রতিযোগী এক ক্ষুব্ধ মানসিকতা ও প্রতিবাদী বোধ ভাবনার শরিক আজকের রাজবংশী সমাজ। সামগ্রিকভাবে নয় তবে বৃহৎ অংশের মধ্যে এই সূক্ষ্ম অনুভূতি সক্রিয় হয়েছে। যার ফলে বিভিন্ন সংগঠন, আন্দোলনে এরা ছুটে যান চাপা এক অভিমান নিয়ে। 'নিজভূমে পরবাসী'র যন্ত্রণা নিয়ে তারা সমবেত হন। বর্ণহিন্দু অভিবাসী মানুষের সঙ্গে এক অদৃশ্য বিভেদরেখার চোরাস্রোত বহমান। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, মর্যাদা কিংবা সহমর্মিতার যে জায়গাটি ছিল সেটা বিগত কয়েক দশকে ক্রমশ নষ্ট হয়েছে। উভয় সমাজই এই বন্ধনের জায়গাটিকে উপেক্ষা করেছে। ফলত: সমাজের যে উপাদানগুলি (Ingradiant) সমন্বয় সাধনে কার্যকরী ছিল সেগুলিকে বিভিন্নভাবে নষ্ট হয়েছে। রাজনৈতিক কারণেও সেটা হয়েছে, বরং বলা যায় এই বিভেদকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সমাজ বিন্যাসের উর্বর ভাবনায় এই উপাদানগুলিকে কাজে লাগানো হয়নি। বরং রাজনৈতিক স্বার্থে উপেক্ষা করা হয়েছে। ফলে আর্থ-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে মনন ও সহনশীলতার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহমর্মিতার জায়গায় সামগ্রিক যে জায়গাটি ছিল বিগত চার-পাঁচ দশকে সেটা বিনষ্ট হয়। সেটার জন্য বর্ণহিন্দুরা যেমন দায়ী, রাজবংশী সমাজও সমান দায়ী। উভয় সমাজের কিছু মানুষের আগ্রাসী মনোভাব যেমন দায়ী তেমনি পিছিয়ে পড়ে মানসিকতারও বিবর্তন ও অবনতি ঘটেছে বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের একটা বিশাল অংশের মধ্যে। রাজবংশী সমাজের নতুন সৃষ্টি হওয়া যে মধ্যবিত্ত সমাজ (চাকুরি, ব্যবসা

কিংবা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী) তারাও নিজেদেরকে সরিয়ে রাখে। ফলত: বিভেদ রেখা কিংবা সমাজ বিন্যাসের ভাবনায় গ্রাম সমাজের চরিত্র বদলে যায়। সেটারই প্রতিফলন ঘটে বিভিন্ন সময়ের ঘটনা কিংবা সামাজিক প্রক্ষেপে।

তথ্য সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনে নানাবিধ কারণ উঠে আসে। অতীতে ব্রিটিশ সরকারের সময়কালে সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে উত্তরবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ছিল রাজবংশী সম্প্রদায় এবং এদের অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি ছিল কৃষি অর্থনীতি।[২] কৃষি বলয়ের প্রায় সব জমিই ছিল রাজবংশী ও কিছু মুসলমান সম্প্রদায়ের অধীনে। এই ব্যবস্থাটি স্বাধীনোত্তর সময়ে ভেঙে যায়। জমিদারী উচ্ছেদ আইন (১৯৫৩) ও জমির উর্দ্ধসীমা আইনের (১৯৫৫) আওতায় রাজবংশী জোতদার সমাজ জমি হারায়। পরবর্তীকালে অপারেশন বর্গা আইনে রাজবংশী সমাজের চিরায়ত ভূমি সমাজ ব্যবস্থাটি ছত্রখান হয়ে পড়ে। গিরি, আধিয়ার ব্যবস্থা লোপ পেয়ে সম্পর্কের অবনতি হয়। অনেক জোতদার নিজেই চুকানিদার ও আধিয়ারে (ভাগচাষি) পরিণত হয়। সামন্ত্রতান্ত্রিক মানসিকতার দিক থেকে সমাজ বিমুখ করে তোলে ভূমি হারানো জোতদারকে। সামাজিক বিন্যাসের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে। স্বাভাবিক ভাবে সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে তরান্বিত করে। সম্পূর্ণ ভূমি নির্ভর সমাজ এক নতুন সংকটে আবর্তিত হতে থাকে। ভূমি ছেড়ে বিভিন্ন পেশায় ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটিও সংকুচিত হতে থাকে। আবার সাতের দশকে বিপুল অভিবাসনের ফলে ভূমির উপর চাপ পড়ে। গ্রামগঞ্জের জনবিন্যাসের চেহারাও বদলে যায়। একটা অদৃশ্য প্রতিযোগিতাও শুরু হয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহের ক্ষেত্রেও তাই। স্বাধীনতার আগে এই জেলাগুলিতে রাজবংশী, পলিয়া, দেশীয়াদের প্রতিপত্তি ও সংখ্যাধিক্য ছিল বলা যায়। কিন্তু দেশ ভাগ ও পরবর্তীকালে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের আগমনে গোষ্ঠীবদ্ধ ও সংরক্ষণশীল রাজবংশী সমাজ বৃহত্তর বর্ণহিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে সহাবস্থানে বাধ্য হয়। স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তনের প্রবণতাও তৈরি হয়। এই তিন জেলায় (উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ) তাই গাঙ্গেয় প্রভাব অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করে।

রাজবংশী জোতদারদের জীবন সংস্কৃতির আরেকটি ঋণাত্মক দিক (Negative) ছিল আধুনিক শিক্ষার প্রতি উদাসীন মনোভাব[৩] এবং ভবিষ্যতের চিন্তা না করে সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার কিছু দিক। যেমন - ভোগবিলাস যুক্ত জীবন, পারিবারিক পরম্পরা, সামাজিক মর্যাদা, জোতদারি

ঐতিহ্য প্রভৃতি রক্ষায় আড়ম্বরপূর্ণ বেহিসেবি খরচ, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি কিছু বিষয়।[৪] যা পরবর্তীকালে পরিবারগুলিকে চরম বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোও এর ব্যতিক্রম ছিল না। পূজা-পার্বণ থেকে দান ধ্যান, গান বাজনা, খাওয়া দাওয়া সবেতেই বেহিসেবি খরচের বিষয়টি তথ্য সমীক্ষায় উঠে আসে। মামলা মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হওয়ার ঘটনাও কম নয়। দেউনিয়া (দেওয়ানী) মানসিকতায় অনেক জোতদারের সর্বনাশ হয়েছে। পরবর্তীকালে তারা আধিপত্যহীনতাবোধ থেকে হতাশায় পর্যবসিত হয়েছেন। শিক্ষার বিষয়ে উদাসীন এবং অনাগ্রহী থাকার ফলে পরবর্তীকালে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম অন্যান্য পেশাতে পিছিয়ে পড়ে। শিক্ষার বিষয়ে আগ্রহ ও সচেতনতা পরবর্তী সময়ে বৃদ্ধি পেলেও ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যায়। আবার রাজবংশী সমাজের কিছু মানুষ শিক্ষালাভ করে চাকুরি বা অন্য পেশায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে শহরবাসী হয়ে সমাজ বিমুখ হয়। সাংস্কৃতিক বিবর্তনের শরিক হয়। আচার ব্যবহার থেকে সংস্কার এমনকী অসবর্ণ বিবাহের সম্পর্কেও আবদ্ধ হয়। আবার একটা শ্রেণির মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি মানসিকতারও জন্ম হয়। স্বাভাবিকভাবে সংস্কৃতির পরিসরে তার সামগ্রিক প্রভাব পড়ে।

আবার আধুনিকতার অনুষঙ্গগুলিও গ্রামীণ সমাজে বিস্তার লাভ করে। শহরের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ, যোগাযোগের সম্প্রসারণ, দূরদর্শন, ভিডিও, সিনেমা, বিভিন্ন সমাজের সঙ্গে নৈকট্য, পেশাগত বৈচিত্র্য ইত্যাদি কারণেও রাজবংশী সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে।[৫] এখানে হীনমন্যতা বোধ, কিংবা অনুকরণাত্মক মানসিকতাও কার্যকরী হয়। আর্থ-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজবংশী সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিগত কয়েক দশকে বিশেষ করে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কাল থেকে দ্রুত পরিবর্তিত হয়। শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীলতা যেমন কমে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। স্বাভাবিকভাবে অ-কৃষি কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানগুলির গুরুত্ব একটা শ্রেণির কাছে কমে যায় আবার অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে সংশ্লেষণ ও আত্তীকরণের প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। পাশাপাশি রাজবংশী সমাজের মধ্যে আচরিত ধর্মাকর্মানুষ্ঠানগুলির অনেকগুলি অবলুপ্তির পথে যায়।[৬] সেইসঙ্গে শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সাথে সাথে ওঝা, গুনীন, ভৌরিয়া এদের গুরুত্বও কমে যায়। নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ ও সংরক্ষণশীলতার জন্য পূজা পদ্ধতির মন্ত্রাবলী এমনকী অধিকারী পুরোহিত সম্প্রদায়েরও প্রভাব প্রতিপত্তি ও সংখ্যাও কমে যায়। স্বাভাবিকভাবে ধর্মীয় সংস্কৃতির জায়গাটিও

সংকুচিত হতে থাকে। এভাবেই লোকায়ত, ধর্মীয় পূজা-পার্বণ থেকে আচার ব্যবহার সংস্কার সর্বোপরি সামগ্রিক জীবনচর্যার বিষয়গুলিও পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন প্রক্রিয়াটি সামগ্রিকভাবে সংঘটিত হয়। উল্লেখিত বিভিন্ন কারণের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়ে এই বিবর্তনকে বিগত চার-পাঁচ দশকে তরান্বিত করেছে। আরেকটি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ্য যে স্বাধীনতা ও দেশভাগের ফলে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্থ হয় কারণ বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। একটা অংশ থেকে যায় পূর্ববঙ্গে, আরেকটা বৃহৎ অংশ ঢুকে যায় অসম প্রদেশে। ফলে প্রাদেশিক অধীনতা যেমন কার্যকরী হয় তেমনি অঞ্চলভিত্তিক বিভাজনেও রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। ভাষাগত, সংস্কৃতিগত বিমিশ্রণের শিকার হয়। ভবিষ্যতেও হয়ত এই প্রক্রিয়া চলবে তবে এই পরিবর্তন নৃ-গোষ্ঠীগত প্রেক্ষাপটে সম্পন্ন না হলে এই জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব যেমন অনেক প্রশ্নের জন্ম দেবে তেমনি জাতিসত্তার সংকটে এই জনগোষ্ঠী আবারও আবর্তিত হবে। কারণ সাংস্কৃতিক পরিসরই যে কোন গোষ্ঠীর নৃ-গোষ্ঠীগত চিহ্ন বহন করে।[৭]

তথ্যসূত্র :

১. রায়, গৌরাঙ্গ চন্দ্র; কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের রূপরেখা, কামরূপ থেকে কোচবিহার, আমজাদ হুসাইন (সম্পাদিত), সুহৃদ পাবলিকেশন, কল - ৭৩, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ১৫৫

২. Gruning, J F; Eastern Bengal & Assam District Gazetteers, Jalpaiguri, Allahabad, 1911, reprinted N. L. Publisher, Siliguri 2008. Page - 102

৩. রায়, নির্মলচন্দ্র; জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সের রাজবংশী জোতদার সমাজ ও তাদের জীবন (প্রবন্ধ) আনন্দগোপাল ঘোষ, নির্মলচন্দ্র রায় (সম্পা) ১৯৪৭ পরবর্তী উত্তরবঙ্গ। সংবেদন; বি এস রোড, মালদা - ২০১৪। পৃষ্ঠা - ১৫৪

৪. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৫১

৫. রায়, গিরিজাশংকর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, ২য় প্রকাশ, এন. এল. পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - XXXI

৬. রায়, গিরিজাশংকর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, ২য় প্রকাশ, এন. এল. পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - XXXII

৭. রায়, জ্যোতির্ময়; রাজবংশী সমাজ দর্পণ, ভাষাবন্ধন, কল - ৩২, পৃষ্ঠা ২৫৮-২৬৪, ২০১২